দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 09 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ...

আমাদের উচ্চশিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা

প্রফেসর গোলাম রসুল

শিক্ষাঙ্গন

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দান ১৯৯২-এ বিএনপি সরকারের একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল। দেশে ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার চাহিদা মুষ্টিমেয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করতে পারছিল না। উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী একটি বিরাট অংশ পার্শ্ববর্তী দেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছিল। ছাত্রছাত্রীদের এই বিদেশ পাড়ি জমানোর ফলে আমাদের কষ্টোপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশীদের অর্থভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করছিল। বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনয়তা এবং গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গত শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর 'সিরডাপ' মিলনায়তনে ইউনিভার্সেল নিউজ এজেন্সী (ইউএনও) ও এশিয়া ডাইজেস্ট-এর সহযোগিতায় দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা বিদদের নিয়ে একটি গোল টেবিল বৈঠকে শিক্ষাবিদগণ বলেছেন যে, এই দশ বছরেও এদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'প্রতিষ্ঠার' উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয়নি। তাঁরা বলেছেন এসব বিশ্ববিদ্যালয় সেরা কোচিং সেন্টারের মত ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানদান করছেন। তারা আরো মন্তব্য করেছেন যে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের যেন মুরগীর ফার্মের মত রাখা হয়েছে। তাঁদের আলোচনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছাত্র বেতনে বৈষম্যের কথা, প্রশাসনিক জটিলতা, অর্থনৈতিক অনিয়ম, ব্যাপকভাবে পার্টটাইম শিক্ষক নিয়োগের দ্বারা উচ্চ শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে বিপন্ন করার কথা। কিন্তু এটাই বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক চিত্র নয়, আংশিক মাত্র।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতষ্ঠার যে মহৎ লক্ষ্য তার মর্মমূলেই একটি বিচ্যুতি বিদ্যামান ছিল। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সংরক্ষিত তহবিল (Reserve fund) হিসাবে এক কোটি টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। এই শর্তটি দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিচালনা ও পাঠ্যক্রম সম্পর্কে দীর্ঘ দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল, যাঁদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচিতি, খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা ছিল– তাঁদেরকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্যোগ থেকে বিরত রাখলো। এ দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণের মধ্যে বিত্তবানের সংখ্যা স্যামান্যই। ফলে এক কোটি টাকা সংগ্রহ করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা দুঃস্বপ্নই রয়ে গেল তাদের জন্য। পরবর্তীতে এক কোটি টাকার সংরক্ষিত তহবিল বেড়ে পাঁচ কোটি নির্ধারিত হলো। পরিণতিতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিত্তবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। আর বিত্তবানদের বৃহৎ অংশই ব্যবসায়ী। এ কারণে যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়িক চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা প্রাধান্য পায়, তাতে বিচলিত হবার কি আছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিএনপি সরকার 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২' ৬ (ছয়) পৃষ্ঠার এক বিধান গেজেট আকারে রবিবার ৯ আগস্ট ১৯৯২ ... খ প্রকাশ করলেন। আওয়ামী লীগ ... র উক্ত চার পৃষ্ঠার গেজেটের এক ... ধনী প্রকাশ করলেন রবিবার এপ্রিল- ... ১৯৮ সালে। বিএনপি এবং আওয়ামী ... সরকার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ... লনা জন্য গেজেট আকারে যে ... মালা জারি করলেন বাংলাদেশে ... সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ... যুগান্তকারী দিকনির্দেশনা হয়ে থাকবে। ... র পৃষ্ঠার বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ গেজেটের ১৪ নং ধারার (১) এর ক উপধারায়- 'অন্যূন নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি সিন্ডিকেট, পরিচালনা পর্যদ, রিজেন্সি কাউন্সিল বা ট্রাস্টি বোর্ড; (খ) উপধারায় অন্যূন নয় সদস্য বিশিষ্ট একাডেমিক কাউন্সিল' থাকবে। (গেজেট পৃষ্ঠা-৭৫৮৪) কিন্তু এই সিন্ডিকেট অথবা একাডেমিক কাউন্সিল কাদের নিয়ে গঠিত হবে তার কোন উল্লেখ নেই। ফলে সকল বেসরকারী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এবং একাডেমিক কাউন্সিল গঠনে অভিন্ন নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। এমনকি উল্লিখিত গেজেটের ধারা ৭-এর 'চ' উপধারা, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ ধারা যথাযথভাবে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয়নি। ফলে একটি সুস্পষ্ট এবং সুসম অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। প্রশাসনের কিম্বা শিক্ষক মণ্ডলীর ক্ষেত্রে অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক Full time techers নেই। তাদের জন্য নেই কোন সুস্পষ্ট বেতন কাঠামো; নেই চাকরি বিধি, নেই Promotion-এর নীতিমালা। এক্ষেত্রেও Part time teachers-এর মতো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়ে থাকে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে Part time শিক্ষকদের Semisterভিত্তিক নিয়োগ হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে এসব খণ্ডকালীন শিক্ষক ক্লাস লেকচারের চেয়ে লেকচার শীট (Lecture sheet) বিতরণ করে ছাত্রদের খুশি করে থাকেন। একজন Part time Teaching করে ৭/৮ এমনকির ১০/১২টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি শ্রেণীকক্ষে অথবা উত্তরপত্র মূল্যায়নে কখনোই Jutice দিতে পারেন না। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে এবং মূল্যায়নে তার ভূমিকা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কর্তৃপক্ষের কারণেই Full time অথবা Part time শিক্ষকদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমতা এবং দায়িত্ব বোধ গড়ে ওঠে না। আমি যে কথা এখানে লিখছি, তা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতেই লিখছি। কোনকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে চার মাসের তিনটি অথবা ছয় মাসের দুটো সেমিস্টার চালু আছে। তিন সেমিস্টার যেখানে চালু আছে সেখানে চতুরপন্থায় নানা খাতে ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের একটি প্রক্রিয়া বহাল আছে। ক্লাস লেকচার ও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে Mid term পরীক্ষা ও Assignment. ফলে চার মাসের সেমিস্টারে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থ দুঃখজনকভাবে উপেক্ষিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের Lecture sheet নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সিলেবাস বলে যে একটা বিষয় আছে, যার সাথে ছেলে মেয়েদের পরিচয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন তা কখনোই হয় না। যা হয়ে থাকে তাহলো অর্থ উপার্জন।

অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সন্দেহাতীত নয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় Part time techer দের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে Teacherরা কোর্স টিচার হিসাবে প্রশ্ন করেন, খাতা দেখেন এবং উক্ত teacter হয়তো আরো ৭/৮টি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। শ্রম এবং সময় বাঁচাতে গিয়ে কি করে থাকেন আলোচ্য শিক্ষক তা অবশ্যই ভাবার বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মেধার মূল্যায়নে আমি মনে করি Viva পরীক্ষায় অবশ্যই External expart আনা প্রয়োজন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশের পরীক্ষা পদ্ধতির স্বচ্ছতা প্রশ্নাতীত নয়। আর বছরে দু'টো সেমিস্টার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় অর্থ উপার্জনই হবে মুখ্য ছাত্রছাত্রীদের মেধা ও ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে।

সরকারী অথবা বেসরকারী হোক সব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতি হলো তাদের প্রশাসনিক অবকাঠামা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রশাসনিক অবকাঠামোয় কর্মরত প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দারুণভাবে উপেক্ষিত। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাত্র চারমাসের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোন চাকরিবিধি নেই। বেতন কাঠামো নেই, নেই ঈদ উৎসব ভাতাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ভাতা। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অভাবী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ওপর অমানবিক জুলুম চালায়, যা জরুরী ভিত্তিতে বন্ধ হওয়া উচিত।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অভিশাপ হলো আত্মীয়করণ। প্রতিষ্ঠাতাদের, পরিচালনা পর্যদের অথবা বোর্ড অব গভর্নর্সের যত অযোগ্য আত্মীয়স্বজন এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত আছে। যারা পাঁচ কোটি টাকা Reserve Fund জমা দিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন তাদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং আমলা আছেন এদের মধ্যে। প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে কয়েকজন শিক্ষাবিদ এবং আমলা অবস্থান করছেন তা যথেষ্ট আনন্দের। তবে এইসব প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী ও জনাকয়েক শিক্ষাবিদ ও আমলাদের দ্বারা পরিচালিত অনুমোদনপ্রাপ্ত ৩৪টি এবং অনুমোদনের অপেক্ষায় আরো ৮টিসহ মোট ৪২টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনাকে কতটা প্রসারিত করবে তা ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিয়ে শুধু এই টুকু বলতে চাই যে, বর্তমানে যে ৩৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে তার অধিকাংশই ভাল ব্যবসা করছে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারকে পুঁজি করে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সিরডাপ মিলনায়তনে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদদের আলোচনায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈন্য ও দুর্দশার বাস্তব চিত্রটি ফুটি উঠেছে। এই প্রসঙ্গে দুঃখজনক হলেও

একটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি– দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবগুলোতে যারা ভাইস-চ্যান্সেলরের পদগুলো অলংকৃত করছেন তাঁরা আমাদের দেশের কৃতী শিক্ষাবিদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং বলতে গেলে প্রায় সকলেরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নানা পর্যায়ে সম্পৃক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও জাতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কাংক্ষিত ফল অর্জনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবদান রাখতে পারলো না। কারণ পেশাগত জীবনে তাঁরা অবসর নিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালগুলোতে ভাল বেতন এবং ভাতাদি নিয়ে চাকরি করছেন।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত, প্রশাসনিক অবকাঠামোগত এবং স্থায়ী স্থাপনাগত বিস্তার, প্রসার এবং মানোন্নয়নের প্রশ্নে প্রতিষ্ঠাতাদের (যাঁদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী) সাথে তাঁরা কোন বিরোধে যেতে চান না। তাদের প্রদত্ত কর্মসূচী মনে নিয়ে অধিকাংশ ভাইস চ্যান্সেলর নিরাপদে এবং কণ্ঠামুক্ত চিত্তে চাকরিতে বহাল থাকতে বেশী পছন্দ করেন। ফলে বেসরকারী পর্যায়ে জাতীয় উচ্চশিক্ষার মূল যে লক্ষ্য ছিল তা বিচ্যুত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২' এবং ১৯৯৮ সালের সংশোধিত আইনের যথাক্রমে ৬ ও ৪ পৃষ্ঠার গেজেট আকারে প্রকাশিত বিধিমালা দ্বারা বেসরকারী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার মহৎ পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় তা অনুধাবন করতে পেরেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি-২০০১' শীর্ষক একটি খসড়া সংবিধি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলর ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময় বিতরণ করে। ভাইস-চ্যান্সেলরদের অধিকাংশ এতে উৎসাহিত এবং আনন্দিত বোধ করলেও প্রতিষ্ঠাতারা দারুণভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেই শুধু থেমে থাকেননি। তারা 'সিবিএ' ধরনের একটি 'প্রতিষ্ঠাতা ফোরাম' গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেই মহৎ উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়নের অন্তরায় সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। অথচ এতে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৫% ভাগ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নামে একটি কর্তৃপক্ষ শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তদারকির দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় এর লোকবল, অর্থবল এবং আনুষঙ্গিক লজিস্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত দুর্বল। এতদ্ব্যতীত রয়েছে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতি। ফলে ইউজিসি. কাংক্ষিত অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। মাননীয়

শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা এবং অবকাঠামোগত মাননিয়ন্ত্রণ ও মানোন্নয়নের জন্য যে 'এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল' গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন তা অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধোঃগতি রোধের প্রশ্নে অত্যন্ত বাস্তব সংগত।

এদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাহ্যত আন্দোলন নেই মনে করলে ভুল হবে। দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে প্রায় সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিঃশব্দে আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছে।

বুয়েট, ঢাবি, রাবি, শাবিসহ দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুকৌশলে ছাত্র আন্দোলনের আগুন উস্কে দেয়ার চেষ্টা চালু আছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নয়। এদিকে মনোযোগ না দিলে যে কোন সময় দাবাগ্নির মতো বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সর্বগ্রাসী বহ্নির বিস্তার ঘটবে। বর্তমানে দেশের জনগণের মনের অবস্থা ভাল নয়। আশা ভঙ্গের যন্ত্রণার আগুন তাদের মনেও আছে। এখন মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে যে, এই দুই আগুন যেন একত্র না হয়। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা আপাতত শান্ত। এই পরিস্থিতি বহাল রাখার জন্য কালবিলম্ব না করে আশু সমাধান সম্ভব সমস্যাগুলোর সমাধান দেয়া হোক।

যেমন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শতকরা ৫% গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বি... বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যানুসারে আর্থিক সুবিধা দেয়া এবং পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, কমপক্ষে পঁচাত্তর ভাগ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দেশের দ্রব্যমূল্যের সাথে সংগতিপূর্ণ বেতন কাঠামো এবং উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য ভাতাদি প্রদান। জরুরী ভিত্তিতে চাকরি বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 'এই টাকায় চাকরি করুন অথবা যেখানে খুশি চলে যান'। দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে এই নোংড়া মনোভাব প্রকাশের ঔদ্ধত্য বন্ধ করতে হবে।

প্রচলিত কর ফাঁকি দেয়ার নামে একাধিক হিসাব-খাতা রাখার প্রথা, প্রতিষ্ঠানের নামে-বেনামে প্রয়োজনে অনেক অনেক বেশী জমি ক্রয়ের দুর্নীতি উদঘাটন করা। ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তরপত্র মূল্যায়নে গ্রেডিং এ ক্লাসে পড়ানোর পরিবর্তে লেকচার শীট প্রদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বচ্ছ... নিশ্চিত করা, মেধার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সেমিনার, সিম্পোজিয়া, ওয়ার্কশপের ব্য... ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতন্ত্র কমন রুম, ইনডোর আউট ডোর খেলার সামগ্রীর ব্যবস্থা কমনরুমে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ছাত্রছাত্রীদের বেতনের শতকরা ৫... ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া এবং আনু... কল্যাণে ব্যয় করা। ছাত্রছাত্রীদের ... নিশ্চিত করা।

পরিশেষে বলবো 'ইউজিসি'র নির্ধ... ফরমে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়... বার্ষিক রিপোর্টের সাথে বিশ্ববিদ্যা... অবস্থার মিল খুবই কম। ইউজিসি... কর্তৃপক্ষকে খুশি রাখতে পারলেই

বেসরকারী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কোন ... আর বাস্তবে থাকে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত... দেখা যাবে যে 'Non-profit সাই... বোর্ডের ছদ্মাবরণে উচ্চশিক্ষা প্রদানের শ্লোগানকে পুঁজি করে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠা... সফল ব্যবসা করছে। জাতীয় স্বার্থে এই প্রবণতার প্রতিরোধ অনতিবিলম্বে প্রয়োজন